নন্দ ঘোষের কড়চা

স্বরূপ গোস্বামী

নন্দ ঘোষের কড়চা

(প্রথম খণ্ড)

স্বরূপ গোস্বামী

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর, ২০২৪

যোগাযোগ

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন

কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক,

কলকাতা ১০৬

ফোন

৯৮৩১২২৭২০১

ই-মেল

bengaltimes.in@gmail.com

উৎসর্গ

অনেক সমস্যা যাঁকে বলে
হালকা হওয়া যায়, সেই
অভিজিৎ দে–কে

লেখকের অন্যান্য বই

❑ খোলা চিঠি
❑ খোলা চোখে, খোলা মনে
❑ লাল গোলাপ, লাল কার্ড
❑ শুনুন ধর্মাবতার
❑ পাল্টা হাওয়া
❑ কলম চলছে
❑ সাদা–কালোর বাইরে
❑ মূলস্রোতের বাইরে
❑ পাহাড়ি পথের বাঁকে
❑ বুদ্ধিজীবী সমাচার
❑ সুচরিতাসু
❑ নেতারহাটে নিশির ডাক

সবিনয় নিবেদন

দেখতে দেখতে বেঙ্গল টাইমসের দশ বছর হয়ে গেল। এই দশ বছরে, বিশেষ করে শেষ পাঁচ বছরে অন্তত দেড়শোখানা ই-ম্যাগাজিন দিনের আলো দেখেছে। কিন্তু তারপরেও যদি প্রশ্ন করা হয়, বেঙ্গল টাইমসের সবথেকে জনপ্রিয় বিভাগ কী? এককথায় উত্তর, নন্দ ঘোষের কড়চা।

কথায় আছে, যত দোষ, নন্দ ঘোষ। অর্থাৎ, সবাই তাঁর দোষ খোঁজেন। কিন্তু এখানে উল্টো। এখানে নন্দ ঘোষ বেরিয়ে পড়েছেন লোকের খুঁত ধরতে।

রবীন্দ্রনাথ হোক বা নেতাজি, সৌরভ গাঙ্গুলি হোক বা সৃজিত মুখার্জি— নন্দ ঘোষের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই। একটা ইস্যু পেলেই হল। না পেলে, তিনি নিজেই তৈরি করে নেন।

একটা সময় রোজ দুপুর বারোটা নাগাদ নন্দ ঘোষের কড়চা আপলোড হত। পাঠকেরা অপেক্ষায় থাকতেন, আজ নন্দ ঘোষ কার ‘সুখ্যাতি’ করবেন! মানে, কার গুষ্টি উদ্ধার করবেন। রাজনীতি থেকে সাহিত্য, বিনোদন থেকে বাণিজ্য, পর্যটন থেকে খেলা। সর্বত্রই ছিল নন্দ ঘোষের অবাধ গতিবিধি। তিনি বোঝেন না, এমন কোনও বিষয় নেই।

দশ বছর উপলক্ষ্যে মনে হল, নন্দ ঘোষের সেই পুরনো কলামগুলো যদি ই-বুকের মোড়কে ফিরিয়ে আনা যায়! কিন্তু এত পুরনো লেখা, খুঁজে পাওয়াই তো মুশকিল। তাছাড়া, পরের দিকে নন্দ ঘোষের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। কলামটাও কিছুটা অনিয়মিত হয়ে যায়। তখন প্রতিদিনের বদলে প্রতি সপ্তাহে হাজিরা দিতে লাগলেন। নেই নেই করে সেই কড়চাও তিনশোর ওপরই হবে।

সবগুলো প্রকাশ করতে গেলে আস্ত এক অমনিবাস হয়ে যাবে। তাছাড়া, তখনকার সব লেখা এখন প্রাসঙ্গিকও নয়। যে ঘটনার ভিত্তিতে লেখা, সেই ঘটনাই মানুষের স্মৃতি

থেকে হারিয়ে গেছে। ফলে, এখন সেইসব লেখার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করা কিছুটা কঠিনই হবে। পাঠকের স্মৃতির ওপর এতখানি চাপ দেওয়াও ঠিক নয়।

তাই, প্রথম কিস্তিতে আপাতত একডজন লেখা হাজির করা হল। প্রায় সব লেখাই ২০১৫-১৬ এই সময়ের। নন্দ ঘোষ নিয়ে এমন সংকলন কতগুলো বেরোবে, এখনই বলা মুশকিল। ঝাড়াই বাছাই করেও গোটা দশেক তো হতেই পারে। আপাতত শুরু তো হোক। ই-বুকের কলেবর বেশি হলে পড়ার ধৈর্য থাকে না। তাই, সচেতনভাবেই এই কলেবর একশো পাতার নিচেই রাখা হল।

পরের কিস্তি কখন? অপেক্ষায় থাকুন, হয়তো দিন দশেকের মধ্যেই।

বিধিসম্মত সতর্কীকরণ: কাউকে অসম্মান করার জন্য এই কড়চা নয়। এই কলামটি ছিল নিছক মজার একটি কলাম। এগুলিকে মজার লেখা হিসেবেই দেখুন।

স্বরূপ গোস্বামী
সম্পাদক
বেঙ্গল টাইমস

পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যাসাগর

আপনি নাকি বিদ্যাসাগর। তা, এমন নামটি কে দিয়েছিল মশাই? যিনিই দিয়ে থাকুক, আপনি একবারও বারণ করলেন না? সবাই আপনাকে দিব্যি বিদ্যাসাগর বলে চিনে গেল। আপনি মনে মনে বেশ মজা পেলেন। পদবী উড়ে গেল। নতুন পদবী এসে গেল।

বিদ্যা নাকি বিনয়ী করে। আপনার তো মশাই অনেক বিদ্যা ছিল। তাহলে বিনয়ী

হননি কেন? কেন নিজেকে বিদ্যাসাগর বলে ঢাক পেটাতেন? একবার তো বারণ করতে পারতেন।

আপনার সঙ্গে মশাই একজনের খুব মিল পাচ্ছি। একটা সুলভ শৌচাগার উদ্বোধন করতে গিয়েও পাড়ার কাউন্সিলরদের বলতে হয়, অমুকের অনুপ্রেরণায় জনসাধারণের জন্য এই শৌচাগারটি করা হল। সব বিজ্ঞাপনে একজনের বড় ছবি। বড় বড় হোর্ডিংয়ে তিনি। তিনি একবার বারণ করলেই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনি বারণ করেন না। শুনেছি, কোন ছবিটা কোন বিজ্ঞাপনে যাবে, নিজে নাকি বেছে দেন। তিনি সবার অনুপ্রেরণা। এখন বুঝছি

আসল নাটের গুরু আপনি। আপনি বোধ হয় তাঁর অনুপ্রেরণা।

আপনি নাকি মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে দামোদর পেরিয়েছিলেন। যারা দুর্গাপুর ব্যারেজ দিয়ে পেরিয়েছে, তারা ভাবে দামোদর মানে বোধ হয় বিশাল কিছু। আপনি যে দামোদর পেরিয়েছেন, সেটা মোটেই চওড়া নদী নয়। টালি নালার থেকে একটু বড়। সেই নদী পেরিয়ে এত বলার কী আছে মশাই? যারা আপনাকে নিয়ে তিন-চার লাইন জানে, তারাও জানে আপনার নদী পেরোনোর কথা। এই বাংলার কত লোক ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে গেল, কেউ তাঁদের খোঁজও রাখে না। আর আপনি

একটা নালার মতো নদী পেরিয়েছেন (তাও আবার সত্যি পেরিয়েছেন কিনা সন্দেহ আছে), সেটা কিনা টেক্সট বুকে এসে গেল। এবার বুঝছি, কেন কেউ কেউ নিজেকে সিলেবাসে আনতে চাইছেন। এবার বুঝছি, সিঙ্গুর, কন্যাশ্রী এসব কেন সিলেবাসে এসে যাচ্ছে।

কলকাতা আসতে আসতে মাইলস্টোন দেখে আপনি নাকি সংখ্যা চিনেছিলেন। ভাবুন, কত পিছিয়ে ছিলেন। এখন দু বছরের এক ছোকরা কিনা মোবাইল গেমস খেলছে। চার বছরে চ্যাট, হোয়াটস অ্যাপ করছে। গুগল ম্যাপ থেকে ঠিকানা খুঁজে নিচ্ছে। কোন এক সাহেবের মুখের উপর

আপনি টেবিলে জুতো তুলে বসেছিলেন। সেই সাহেব নেহাত ভদ্রলোক ছিল। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিল। এখন যদি বুড়ো বয়সে পিএইচডি করা শিক্ষামন্ত্রী ঢুকত, পারতেন ওইভাবে বসে থাকতে? শিক্ষামন্ত্রী তো অনেক দূরের কথা মশাই। প্রফেসর বঙ্কু বা কোনও 'দায়িত্বশীল' ছাত্রনেতা ঢুকত, হাড়ে হাড়ে টের পেতেন। আপনার হাড় হিম হয়ে যেত।

হয়ত আপনার ভোটে দাঁড়ানোর শখ হল। আপনার বীরসিংহগ্রাম কোথায়? খোঁজ নিয়ে দেখলাম, ঘাটালের কাছাকাছি। সেখান থেকে আপনি টিকিট পেতেন?

কোনও চান্স নেই। ওখানে ‘দেব’ আছে। দেব থাকতে লোকে আপনাকে টিকিট দেবে কেন? অতএব, আপনাকে থাকতে হত ‘নিষ্ফলের, হতাশের দলে’। নইলে ‘আঙুর ফল টক’ এর মতো বলতে হত, রাজনীতি খুব খারাপ জিনিস।

রাতে ঘুমিয়ে যেতে পারেন, এই আশঙ্কায় আপনি টিকি বেঁধে রাখতেন। যেন ঘুমিয়ে গেলেই টান পড়ে। এখন কাউকে টিঁকি বেঁধে রাখতে হয় না। ওরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। বিশ্বাস না হলে, গভীর রাতে ওদের ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস দেখুন। দেখতে পাবেন, ‘অনলাইন’। আপনি অবশ্য পুরানো যুগের মানুষ। এসব বুঝবেন না।

আপনি নাকি ল্যাম্প পোস্টের নিচে বসে পড়তেন। এখন এই দৃশ্য হামেশাই দেখতে পাই। শহরের নানা জায়গায় ওই ল্যাম্প পোস্টের তলায় মোবাইল নিয়ে সারাক্ষণ একদল ছোকরা কী যেন করে যায়। এটুকু বলতে পারি, বই হাতে আপনার যত না নিষ্ঠা ছিল, স্মার্টফোন হাতে এই ছোকরাদের 'নিষ্ঠা' আপনার থেকে ঢের বেশি। আপনার তবু ল্যাম্প পোস্টের আলো দরকার হত। এদের আলোর দরকার হয় না। আলো না থাকলেও এদের নিষ্ঠায় কোনও ঘাটতি আসে না।

তাহলে কী দাঁড়াল। আপনি একাই বিদ্যাসাগর নন। আপনার মতো

বিদ্যাসাগর এখন পাড়ায় পাড়ায়। তাহলে খামোখা আপনাকে মহাপুরুষের আসনে বসাবো কেন ?

দোহাই, বিভূতিভূষণকে শান্তিতে থাকতে দিন

বিধানচন্দ্র রায় ব্যতিক্রম। আরও দু একজন হয়ত ব্যতিক্রম। বাদবাকিরা সব এক ক্যাটাগরির। যখনই দেখবেন, একজন ডাক্তার ডাক্তারি ছেড়ে অন্য কিছু করছে, তখন বুঝবেন সে ডাক্তারিটা ভাল করে শেখেনি। রোগী আসছে না, মাছি তাড়াচ্ছে। তাই সে কখনও ভোটে দাঁড়িয়ে যায়, কখনও স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হয়ে যায়, আবার কখনও চিত্র পরিচালক হয়ে যায়।

আমাদের কমলেশ্বরের বোধ হয় তেমন

দশাই হয়েছে। কমলেশ্বর মানে, আমাদের কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। তিনি নাকি দারুণ এক বুদ্ধিজীবী। অভিনব বিষয় নিয়ে নাকি সিনেমা বানাচ্ছেন। যাকে ধরছেন, তাঁর পিন্ডি চটকাচ্ছেন। তিনি বানালেন মেঘে ঢাকা তারা। সেটা নাকি ঋত্বিক ঘটকের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। এমন শ্রদ্ধার নমুনা, কিছু বোঝাই গেল না। ঋত্বিক বেঁচে থাকলে বাংলা খেয়ে নির্ঘাত কিছু দারুণ বাক্যালঙ্কার উপহার দিতেন।

শান্তি হল না। তিনি এবার চললেন আফ্রিকায়। চাঁদের পাহাড় বানাবেন। এমন বানালেন, বিভূতিবাবু বেঁচে থাকলে আত্মহত্যা করতেন। শুধু বিভূতিবাবু

কেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন, জঙ্গলের অনেক অ্যানাকোন্ডা বা সিংহেরা আত্মহত্যা করতে শুরু করেছে। দেব-এর হাতে আমাদের এভাবে মরতে হবে? কে সহ্য করবে বলুন তো? জঙ্গলের পশু বলে কি ওদের মান-সম্মান নেই?

এবার ক্ষত। এটা নাকি সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে থাকা সিনেমা। যাঁরা দেখেছেন, হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। যাঁরা দেখেননি, তাঁদের অন্তত কিছু সময় ও অর্থ বেঁচে গেল। প্রমোশনের সময় ভাল ভাল কথা বলতে হয়। প্রসেনজিৎ–পাওলিরাও বললেন। কিন্তু কয়েকবছর পর যদি সেরা ছবির তালিকা বাছতে বলা হয়, প্রসেনজিৎ

নিশ্চয় প্রথম পঞ্চাশের মধ্যে এই ছবিকে রাখবেন না।

এখানেও শান্তি হল না। তিনি এলেন মহানায়ক সিরিয়ালের ধারণা নিয়ে। প্রসেনজিৎ যদি সারা জীবনে নিজের কোনও কাজ নিয়ে অনুতপ্ত থাকেন, তবে তা হল এই মহানায়ক। প্রতি এপিসোডেই নতুন নতুন বিকৃতি। রিসার্চের নামে যতসব গাঁজাখুরি। বড় বড় লোককে শ্রদ্ধা জানানোর নামে এমন পিন্ডি চটকানো কেন বাপু ?

এতেও তাঁর শান্তি হল না। এবার তিনি হাত দিয়েছেন ‘চাঁদের পাহাড় ২’

বানাবেন বলে। আমি নন্দ ঘোষ। লোককে গালাগাল দেওয়াই আমার কাজ। প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি, কাউকেই ছাড়ি না। রবি ঠাকুরকেও গালমন্দ করি। সেই আমিও বিভূতিভূষণকে গালাগাল দিই না। ঋষিতূল্য একজন মানুষ। যিনি পথের পাঁচালি লিখেছেন, যিনি আরণ্যক লিখেছেন, তাঁকে ছোট করতে নেই, এটা আমার মতো মূর্খ লোকও বোঝে। কিন্তু কমলেশ্বর মুখুজ্যের মতো প্রাক্তন ডাক্তার বা নব্য বুদ্ধিজীবীরা বোঝে না। একটা চাঁদের পাহাড় বানিয়ে তৃপ্তি হল না? প্রোডিউসারের টাকা পেয়ে যা খুশি, তাই করবেন? দেবকে নিয়ে এবার চললেন আমাজনের জঙ্গলে। ভয়ে সেই

পশুপাখিরাই জঙ্গল ছেড়ে চলে গেল। তারপর নাকি শুটিং হয়েছে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ে। এখানে নাকি আমাজনের ছায়া পাওয়া গেছে।

আসলে, প্রোডিউসার দেরীতে হলেও বুঝেছেন, এর পেছনে টাকার শ্রাদ্ধ করার কোনও মানে হয় না। তাই আমাজন থেকে একলাফে পুরুলিয়ার অযোধ্যায়। ধুমধাম করে ছবিটা রিলিজ হবে। সবচেয়ে যে মানুষটা কষ্ট পাবেন, তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মনে মনে বলবেন, আমার ছবি সত্যজিৎ রায় বানিয়েছিলেন, এখন আমার এমন দুর্গতি, এইসব লোকগুলো আমাকে নিয়ে যা পারছে, তাই করছে।

তাঁর এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি-র মতো অবস্থা।

তাই যাঁরা বিভূতিবাবুকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা দয়া করে কমলেশ্বরবাবুকে বোঝান। এক কাজ করুন, সবাই মিলে কমলেশ্বর মুখুজ্যেকে একটা চেম্বার খুলে দিন। তিনি আবার মন দিয়ে রোগী দেখুন। তাঁর হতাশা কিছুটা কাটবে। কোন রোগীর কী দুর্গতি হবে জানি না। অন্তত বিভূতিভূষণ বেঁচে যাবেন।

জুলফিকর হইতে সাবধান, পরিচালক হইতে আরও সাবধান

তিনি ছবি বানালেই বড় ভয় করে। এমন দুর্বোধ্য বিষয়, তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

এই যে দর্শক বোঝে না, এটা কার দোষ, বলুন তো? উঁহু, পরিচালককে দোষ দেওয়া যাবে না। তিনি মহাপণ্ডিত। দোষ আমার, আপনার মতো আম পাবলিকের। যারা ভাবে সৃজিতের ছবি দেখলে লোকে

বোধ হয় বুদ্ধিজীবী বলবে। এই ভেবে দেখতে যায়। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না।

অন্য পরিচালক তবু সহজভাবে গল্প বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই পরিচালক হলেন মহা পুচ্ছ পাকা। বিস্তর রিসার্চ করেন। তারপর প্রোডিউসারের টাকায় অশ্বডিম্ব প্রসব করেন। কাগজে লেখা হয়, দারুণ একটা বিষয়। এমন বিষয় নিয়ে নাকি আগে কখনও ছবি হয়নি। বাংলা মান নয়, ভারতীয় মান নয়, একেবারে সরাসরি বিশ্বমানের। এসব যদি বলতে পারেন, তাহলে আপনাকে বোদ্ধা হিসেবে মান্যিগন্যি করা হবে। নইলে আপনি বুদ্ধুরাম।

আগের ছবিটাই ধরুন। রাজকাহিনি। কোথায় রাজা, কোথায় কাহিনি। একগুচ্ছ মহিলা। প্রায় এগারোজনের ফুটবল টিম। এতেও বাবুর শান্তি নেই। একই গান এগারো জনকে দিয়ে গাইয়ে দিলেন। একেকজনের ভাগে পড়ল এক লাইন করে। এর নাম পরীক্ষা নিরীক্ষা।

এবার আবার জুলফিকার। কার জুলফি, কীসের ফিকর কে জানে! এখানে তিনি নাকি সেক্সপিয়রকে এনেছেন। অনেকদিন ধরে নাকি তাঁর শখ হয়েছিল একটু সেক্সপিয়র চর্চা করবেন। একটা নয়, দুটো ভিন্ন সময়ের দুটো কাহিনিকে পাঞ্চ করে দিয়েছেন। ভেবে দেখুন দেবদাস আর

পথের দাবিকে পাঞ্চ করলে কেমন হবে। গোরার সঙ্গে যদি চোখের বালি মিশিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কেমন হয়? আজগুবি লাগছে তো? আপনি, আমি বুঝি। কিন্তু ওই সৃজিত মুখুজ্জে বোঝে না। ভারি আমার রিসার্চ করনেওয়ালা। সেক্সপিয়রের পিন্ডি চটকে দিয়েছে মশাই। মরা সাহেব যদি কবর থেকে উঠে আসে, তার জন্য কিন্তু ওই পুচ্ছপাকা পরিচালকই দায়ী।

এতেও বাবুর শান্তি হয়নি। প্রসেনজিৎ আর দেবকে একসঙ্গে নিয়েছেন। পরমব্রতকেও নিয়েছেন, যিশুকেও নিয়েছেন। পাওলি, নুসরতকেও ছাড়েনি। এতেও শান্তি হয়নি। জিৎ আর আবিরকেও

নাকি নিতে চেয়েছিল। শাসক দল যেমন সবাইকে নিয়ে নিচ্ছে, এও অনেকটা তেমনি, একসঙ্গে সবাইকে চাই। এত তারকা নিয়ে কী প্রমাণ করতে চাও বাপু? তুমি খুব হনু? এত তারকাকে একসঙ্গে সত্যজিৎ, ঋত্বিক, মৃণাল, তপন সিনহা, তরুণ মজুমদার- কেউ নামাতে পারেনি। আপনি করে দেখালেন। অতএব আপনি তাঁদের থেকে বড় পরিচালক, এই তো ?

তারকাদেরও বলিহারি বাপু। কী দেখে এইসব ছবিতে নাম লেখাও? একটা ‘নির্বাক’ দেখেও শিক্ষা হয়নি? সুস্মিতা সেন ভেবেছিল, প্রাইজ-টাইজ কিছু একটা পাবে। এখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছে,

ওই ছবি না করলেই ভাল হত। আর এ পথ মাড়ায়নি। তবু ভাল, জিৎ বা আবির বুঝতে পেরেছে। আবিরের মাথায় সত্যিই তাহলে বুদ্ধি আছে (এবার থেকে ওকে ব্যোমকেশ হিসেবে মানা যায়)।

কিন্তু মিডিয়া রিপোর্ট পড়লে মনে হবে অস্কার পাওয়ার মতো একটা ছবি বোধ হয় তৈরি হল। নেহাত বাংলা ভাষা, তাই বঞ্চনার শিকার। জাতীয় স্তরে জুরিরা দু-একটা পুরস্কার দিয়ে দিলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। আসলে, অন্য ছবিগুলো তবু দেখা যায়, বোঝা যায়। এটা তিন ঘণ্টা বসে দেখাও যায় না, দেখলেও বোঝা যায় না। তার থেকে বাপু না দেখে

একটা পুরস্কার দিয়ে দেওয়া অনেক ভাল।

বিশ্বাস করুন, এইভাবেই ছবিগুলো পুরস্কার পায়। চুপি চুপি গোপন কথাটা আপনাদের জানিয়ে দিলাম। আপনারা যেন পাঁচকান করবেন না।

এখন থাকলে বুঝতাম, কেমন মহানায়ক

খুব মহানায়ক হয়েছেন! কেউ ছিল না, ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে ভাবছেন, বিরাট হনু হয়েছেন। থাকতেন এই সময়ে, আপনার হনুত্ব বেরিয়ে যেত।

ধরা যাক, এন কে সলিল সংলাপ লিখল, ‘মারব এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে।’ ক্যামেরার সামনে সেই ডায়লগ দিতে পারতেন? ধরা যাক, আপনি যদি নয়ের দশকে বেঁচে থাকতেন, ছবির নাম হত বাবা কেন চাকর, শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, ঝিনুকমালা, তোমার রক্তে আমার

সোহাগ। বা এই সময়ের ছবি। মন যে করে উড়ু উড়ু, ফাঁদে পড়িয়া বগা কাঁদে, পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, খোকা ৪২০। এই সব ছবির পোস্টারে যদি আপনার ছবি থাকত, নিজেকে মহানায়ক বলে দাবি করতে পারতেন ?

তখন আপনার লিপে কী অসাধারণ গান? কারা গাইত! শ্যামল, হেমন্ত, মান্না, কিশোর। এখন যদি গাইতে হত পাগলু থোড়া সা করলে রোমান্স, ও মধু আই লাভ ইউ। যেখানে সেখানে নয়, এই গানের শুটিং করানোর জন্য আপনাকে নিয়ে যাওয়া হত আন্টার্কটিকা বা হুনুলুলুতে। তখন আর ম্যাটিনি আইডল থাকতেন?

আপনার প্রেস্টিজের গ্যামাকসিন হয়ে যেত। আর জনপ্রিয়তা! সত্যিটা মেনে নেওয়াই ভাল। ভবানীপুর এলাকায় আপনার বাড়ি যত লোক চেনে, তার থেকে ঢের বেশি লোকে চেনে মদন মিত্রর বাড়ি। তাহলে কেন আপনাকে মহানায়ক বলব বলুন তো?

বুঝলেন মশাই, আগে চলে গিয়ে বেঁচে গেছেন। নইলে আপনার যে কী দশা হত! ঋতুপর্ণ তুই-তোকারি করত। আপনার নাম দিত 'উতুদা'। সুচিত্রা পাত্তা দিত না, নাতনিরাও বলত, চিনি না। ধন্যি মেয়ে বা মৌচাকে তো তবু দাদার রোল পেয়েছিলেন, এখন ঠাকুরদার রোলও

পেতেন না। টিভিতে ডাক পাওয়ার জন্যও সুমন দে বা মৌপিয়া নন্দীকে ধরতে হত। নইলে, নিজের টাকায় পনেরো মিনিটের ছবি করে ইউটিউবে ছাড়তে হত। ফেসবুকে শেয়ার করে নিজেই লাইক মারতেন। অথবা, জুলাই মাসের কোনও দুপুরে টিভিতে নিজের সিনেমা দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতেন। হয়ত মনে মনে গাইতেন, আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।

ধরা যাক, আপনার মোবাইলে কোনও এক মোহতা বা কোনও এক বিশ্বাসের মেসেজ এল। কাল ব্রিগেডের সভায় পাগলু নাচতে হবে। পারতেন? ধরা যাক, কোনও এক ব্যানার্জি বললেন, অমুক ওয়ার্ড থেকে

ভোটে দাঁড়াতে হবে। তখন কী করতেন? বা হয়ত বঙ্কু পন্ডার হয়ে প্রচারে যেতে বলা হল। যদি ‘না’ বলতেন, সিনেমা তো দূরের কথা, আর সিরিয়ালেও কাজ পেতেন না। আপনার নামে মেট্রো স্টেশন তো দূরের কথা, পাড়ার টয়লেটও হত না।

নেহাত তখন জন্মেছিলেন, করে-কম্মে খেয়েছেন। এখন হলে নিরেট বেকার হয়েই থাকতে হত। উত্তমবাবু, প্লিজ, অধমের কথায় রাগ করবেন না। সত্যিটা মেনে নিন।

চাঁদে গিয়েছিলেন? ইয়ার্কি পাতা হ্যায়?

ছোট থেকেই মশাই ভুল ইতিহাস পড়ে আসছি। শুধু ইতিহাসই বা বলি কী করে? ভূগোল, বিজ্ঞান সব কিছুতেই গোঁজামিল। ছোট থেকেই শুনছি, নিল আমস্ট্রং নাকি চাঁদে গিয়েছিলেন। সঙ্গে নাকি ছিলেন এডুইন অলড্রিন। তখন ছোট ছিলাম, যে যা বুঝিয়েছে, তাই বুঝেছি। এখন বুঝি, কতবড় গাঁজাখুরি ব্যাপার মাথায় ঢোকানো হয়েছিল।

এখন বুঝি, পুরোটাই ভাঁওতা। একসঙ্গে অনেকের ওপর রাগ হচ্ছে। ব্যাটা নিল আমস্ট্রং, আমাদের চোখে হিরো ছিল। সে কিনা এত বড় একটা বুজরুকি করল? চাঁদে না গিয়েই বলে দিল চাঁদে গিয়েছি? একগুচ্ছ বানানো ছবি বাজারে ছেড়ে দিল? তেনজিং নোরগে একবার এভারেস্টে যাওয়ার পর আরও একবার গিয়েছিল। তাঁর ছেলেও গিয়ে ঘুরে এসেছে। আমস্ট্রং ভাই আর গেলেন না কেন?

ব্যাটা আমেরিকা। তারাও প্রচার করে বেড়ালো, তারা নাকি চাঁদে লোক পাঠিয়েছে। গুলতানি মারার জায়গা পাওনি? এতই যদি মুরোদ, তাহলে ১৯৬৯

এর পর থেকে আর পাঠাতে পারলে না কেন? পৃথিবী এত এগিয়ে গেল, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এত এগিয়ে গেল, কই আর তো পাঠাতে পারলে না? আরেকবার ওবামাকে পাঠাও দেখি, তাহলে বুঝব তোমাদের মুরোদ কত।

নাসা। সে নাকি বিজ্ঞানের বাইবেল। সে ব্যাটারাও কিনা গুলবাজ! তখন থেকেই নাশা যেন নেশায় আক্রান্ত। গাঁজা খেয়ে কী সব তত্ব হাজির করেছিল। আমরা সব উজবুক। যেন কিছুই বুঝি না। যা, আরেকবার যা দেখি, তাহলে বুঝব।

আমাদের রাজ্যের সিপিএম। কথায় কথায়

এত আমেরিকা বিরোধিতা করে। আর আমেরিকা যে এতবড় ধাপ্পা দিল, তার বেলা নীরব। ৩৪ বছর ধরে সিলেবাসে এসব সাজিয়ে রেখেছিলে কেন বাপু ? এমনিতে এত রাশিয়ার কথা শোনো। এই ব্যাপারটায় রাশিয়া বা চীনের কথা শুনলে না কেন? কেন আমেরিকার সুরে সুর মেলালে? সিপিএম মাঝে মাঝেই ভুল স্বীকার করে। এবার স্বীকার করুক, চাঁদে মানুষ পাঠানোর মার্কিনি বুজরুকি প্রচার করা ঐতিহাসিক ভুল ছিল।

মুড়িও খাবে সুমন, চাঁদেও যাবে সুমন!

সন্ধে হলেই বাড়ির লোক টিভিতে সিরিয়াল কিম্বা রিয়ালিটি শো দেখে। আমি হাতে রিমোট পাই খুব কম সময়ের জন্য। আর পেলেই খবরের চ্যানেলগুলো উল্টে-পাল্টে দেখি।

কিন্তু এবিপি আনন্দ খুললেই সুমন দের মুখ পর্দায় ভেসে ওঠে। কী বিরক্ত যে লাগে! আমি সঙ্গে সঙ্গে অন্য চ্যানেলে চলে যাই। খবর, আলোচনা, ইন্টারভিউ সবেতেই একজনের মুখ। চ্যানেলে অন্য কেউ নেই নাকি কে জানে!

অন্য চ্যানেলগুলোতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সবাইকে সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু এবিপি আনন্দ খুললেই সুমন দে। আচ্ছা, কেউ আপত্তি করে না? উনি নিজেও তো বলতে পারেন, সব সময় আমার মুখ দেখিও না। নাকি নিজেই নিজের মুখ দেখাতে উৎসাহ দেন। যদি দেন, তাহলে বলতে হবে, উনি আত্মসর্বস্বতা নামক রোগে ভুগছেন। এই বাংলায় আরও একজন আছেন যিনি এই রোগে আক্রান্ত। তিনি হাওয়াই চটি পরেন। সুমন তাঁর সঙ্গে হেলিকপ্টারে চড়েছেন, এক থালায় মুড়ি খেয়েছেন। লোকে বলে, ভোটে টিকিট না পেয়ে এখন বিপ্লবী হয়েছেন।

এ বি পি আনন্দ অলিম্পিকে গেলে সুমন, চীনে গেলে সুমন, দুবাই গেলে সুমন। বিজ্ঞাপনের কণ্ঠে সুমন, এমনকি অ্যানিমেশনেও সুমন। তাহলে এবিপি আনন্দের লোগো পাল্টে সুমনের মুখ করে দিলেই হয়।

নেতাজি, গান্ধীজি, হেমন্ত, কিশোর, ভানু, জহর, সবার ইন্টারভিউ নিচ্ছে অ্যানিমেশনের মাধ্যমে। কোনদিন হয়তো আদম-ইভের ইন্টারভিউ নেবে।

আবার নিজের নামে অনুষ্ঠান চালু করেছে, ঘণ্টাখানেক সঙ্গে সুমন। শহরের নানা জায়গায় তার কত না হোর্ডিং। ভাবলাম,

দারুণ কিছু হবে। দু একদিন দেখলামও। এখন আর দেখি না। প্রতিদিন এক ঘণ্টা ধরে বকবকানি। ওই ঘণ্টা আমি রিমোটটা বাড়ির লোকের হাতে ছেড়ে দিই। এমন টক-শো দেখার থেকে সিরিয়াল দেখা ভাল।

সূর্যবাবু, আপনি বারণ করার কে?

বাহ। কী আবদার! আপনি একাই সিপিএম করবেন। আর কেউ করবে না। কার্ল মার্কস বোধ হয় শুধু আপনাকেই পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে গেছেন!

ব্রিগেডে লাখ লাখ লোক দেখে আর গনগনে সূর্য দেখে সূর্যবাবুর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল। বলে দিলেন, যারা জাঠায় নেই, যারা ব্রিগেডে নেই, তাদের আমাদের সঙ্গে থাকার দরকার নেই।

বেশ হাততালিও পড়ল। বলি ও সূর্যবাবু, আমার মতো অলস, ভীতু ও নিষ্কর্মা লোকগুলো তাহলে কোথায় যাবে? ধরে নিন, আমি নিপাট একটি অলস মানুষ। ঝুটঝামেলায় থাকি না। চাইলে ভীতুও বলতে পারেন। আমি জাঠা বা ব্রিগেডে যাই না। তাই বলে আমি সিপিএম-কে ভোট দিতে পারব না? আমি কোথায় ভোট দেব, আপনি বলে দেওয়ার কে মশাই!

ওই জাঠায় কী হল, মনে নেই? কেউ কান ধরে উঠ–বোস করাচ্ছে, কেউ মাথায় লাঠির বাড়ি মারছে। আপনাকেও তো ধাক্কাধাক্কি করেছে। তাহলেই বুঝুন, বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্রর গায়েও হাত তুলছে। তাহলে

আমার গায়ে তুলতে কতক্ষণ!

অলস লোকেরা একটু বেশিই টিভি দেখে। ধরে নিন, আমিও তাই। দেখছি সবাই মার খাচ্ছে, আর ওইসব দেখে আমি জাঠায় যাব? আমার ক্ষুদিরাম হওয়ার কোনও শখ নেই। তাছাড়া, আপনি মার খেলে সংগ্রামী, লড়াকু— এসব তকমা পাবেন। ইতিহাসে নাম উঠবে। আর আমি মার খেলে? শ্বশুরবাড়িতেও যেতে পারব না। সাধের শ্যালিকারা কেমন আওয়াজ দেবে, বেশ বুঝতে পারছি। আমি বাপু ওসবে নেই।

আপনি নাকি ডাক্তার ছিলেন। কই, রোগী দেখেন না তো। তাহলে মশাই ডাক্তার

হলেন কেন? নামের আগে ‘ডা’ শব্দটা দেখার জন্য? নাকি ডাক্তার হলে কোনও একদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবেন, সেই জন্য। আপনার ডিগ্রি আছে, তাও চিকিৎসা করেন না। আরেকজনের ডিগ্রি নেই, তাও তাঁর জঙ্গলমহল নামক ঝোলায় সব ওষুধ থাকে। যে যা ওষুধ চায়, দিয়ে দেন। তাহলে কে ভাল ডাক্তার। তা যাক গে, ধরুন, আমি এক প্রাইমারি শিক্ষক। মাইনে না পেলে বউ পেটাবে। আমি বাপু আপনার মতো শিক্ষিত নই। ধরুন পাতি এক মাস্টার, বা সরকারী কর্মী। স্কুলে বা অফিস গেলে, মাইনে পাই। কত পারসেন্ট ডি এ বাড়ল, সেই হিসেব করি। আমি সিএল নিয়ে জাঠায় যাব কেন ? জাঠায় গেলে সরকার ছুটি দেবে?

একটা সাধের রবিবার? তাও আবার বড়দিনের পর শেষ রবিবার। মন উড়ু উড়ু। আমি তো আপনাদের মতো বেরসিক নই। আমার বুঝি বউকে নিয়ে একটু সমুদ্রে যেতে ইচ্ছে করে না? দীঘার সমুদ্রে না গিয়ে আমি জনসমুদ্রে যাব? তারপর বাড়ি ফিরে তৃণমূলের পিটুনি খাই আর কী!

শুনুন মশাই, আমার বউ বলে দিয়েছে, ওসব ঝুটঝামেলায় যেও না। বউয়ের কথা অমৃতসমান। আমি জাঠাতেও নেই। ব্রিগেডেও নেই। মেহনতি মানুষের লড়াই, আন্দোলন বা মিছিলেও নেই।

তবু আমি আপনাদেরই ভোট দেব। আপনি

বারণ করার কে মশাই? স্বয়ং মার্কস বা লেনিন বারণ করলেও শুনব না।

সৌরভকেও তাহলে জার্সি কিনতে হয়!

অনেকদিন আগে একবার বেহালায় সৌরভ গাঙ্গুলির বাড়িতে গিয়েছিলাম। নিচে বসার ঘরে দেখলাম, অনেকগুলো ট্রফি সাজানো। সৌরভ গাঙ্গুলির মতো মানুষ দেশ–বিদেশে নানা ট্রফি, নানা স্মারক পেতেই পারেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমি নন্দ ঘোষ। সবকিছুকেই একটু বাঁকা চোখে দেখি। ফিসফিস করে একজনকে বলে ফেলেছিলাম, এত ট্রফি পেয়েছে? কয়েকটা নিশ্চয় ময়দান মার্কেট থেকে

কেনা। শুনেছি, ঘর সাজাতে অনেকেই ময়দান মার্কেট থেকে এটা-সেটা লিখিয়ে ট্রফি কেনে।

তখন নিছক মজা করে বলেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সত্যি হলেও হতে পারে। রবিবারের অনেক কাগজেই ছবি বেরিয়েছিল, মেয়ে সানাকে নিয়ে বার্সিলোনার গ্যালারিতে সৌরভ। ছবিটা নিজেরই তোলা। জানতেন, আর কেউ ছাপুক না ছাপুক, বাংলা কাগজগুলো তো ছাপবেই। তাই জাতির উদ্দেশে ছবিটা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। সেখানেই খবর বেরিয়েছিল, ম্যাচ দেখে মেসিদের ড্রেসিংরুমে যাবেন। আমরা আশা

করেছিলাম, সোমবারের কাগজে হয়ত মেসির সঙ্গে আমাদের দাদার ছবি দেখব।

ও হরি। কোথায় মেসি! বার্সিলোনার কোনও এক দু–চার আনার কর্তা। তিনি নাকি সৌরভকে বার্সিলোনার জার্সি তুলে দিচ্ছেন। সেই জার্সিতে লেখা দাদা। আর নম্বর লেখা রয়েছে ৯৯।

এখানেই যত খটকা। বার্সিলোনা কি সৌরভের জন্য দাদা লেখা জার্সি বানিয়েছিল? সৌরভকে ‘দাদা’ বলে, তারা জানলা কীভাবে? আর সৌরভ যে আইপিএলে ৯৯ নম্বর জাসি পরতেন, সেটাই বা তারা জানল কীভাবে? সৌরভকে

যদি এতই পাত্তা দেবেন, তাহলে তো তাঁরা মেসিকে দিয়েই জার্সিটা দেওয়াতে পারতেন। সৌরভও নিশ্চয় ওই কর্তারা সঙ্গে ছবি তুলবেন বলে সেজেগুজে যাননি।

নিশ্চয় বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। আরও এটা সেটা অনেক কিছুই বুঝিয়েছেন। বিশেষ ফল হয়নি। না হওয়ারই কথা। একে ক্রিকেট, তারপর আবার ভারত, তারপর আবার প্রাক্তন। সবমিলিয়ে মেসিদের কাছে বিশেষ পাত্তা পাওয়ার কথাও নয়। তাই কোনও এক মাঝারি কর্তা হয়ত ছবি তুলেছেন।

ওই যে ময়দান মার্কেটের ট্রফি কেনার কথা বলছিলাম। সেটাও হতে পারে। জার্সিটা হয়ত সৌরভই কিনে দাদা লিখিয়েছিলেন। বার্সিলোনার সুভেনিয়র শপে নিশ্চয় জার্সিতে নিজের নাম লেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। নিশ্চয় সেখানে পছন্দের নম্বর লেখার ব্যবস্থা থাকবে। ব্যোমকেশ বা ফেলুদা হওয়ার দরকার নেই। এটুকু বোঝা যায় যে, ওই জার্সিটা সৌরভই ব্যবস্থা করেছেন। বার্সিলোনা যদি সম্মান দিত, তাহলে বার্সিলোনার ওয়েবসাইটেই ছবিটা আপলোড করত। এভাবে সৌরভকে ছড়াতে হত না।

মেসি না হয় দেখা করল না। তাই বলে

নিজেকে জার্সি কিনে, নাম লিখিয়ে এভাবে ছবি তুলতে হবে? এটা কি সৌরভকে মানায়?

এবার নিশ্চিত হলাম, বেহালার বাড়ির সব ট্রফিগুলো আসল নয়। দু-একটা নিশ্চয় ময়দান মার্কেট থেকে কেনা।

কমলেশ্বরের ভূত অরিন্দমের ঘাড়ে!

কোনও কিছুতেই এদের শান্তি নেই দাদা। যখন যা পারছে, তাই করছে। আসলে, কোনটা হচ্ছে আর কোনটা হচ্ছে না, এরা নিজেরাই কিছু বুঝতে পারছে না। কখনও ছুটছে সাহিত্যের দিকে, কখনও থ্রিলারের দিকে। কখনও গোয়েন্দা তো কখনও পুলিশ। প্রেম, যৌনতা, হিংসা–এসব তো আছেই। যখন কোনওটাই সামাল দিতে পারছে না, তখন এটার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে ককটেল করে দিচ্ছে।

আমাদের অরিন্দম শীলের হয়েছে সেই দশা। কখন যে কী করবেন, ভেবে পাচ্ছেন না। কী জানি, তিনি হয়ত বলবেন, যখন যেটা করা উচিত, তখন সেটাই করি। যখন মনে হয়েছে সিপিএম করা উচিত, সিপিএম করেছি। আবার যখন মনে হল তৃণমূল করা উচিত, তৃণমূল করছি। তা বা করছেন। এই একটা ব্যাপারে তাঁর টাইমিংয়ে বিশেষ ভুল হয়নি।

রাজনীতি থাক গে। সিনেমার কথায় আসা যাক। বহুদিনের স্বপ্ন ছিল, সিনেমা বানাবেন। সত্যিই তো! কাঁহাতক আর সিরিয়াল বা টেলিফিল্মের অভিনেতা হয়ে থাকা যায়! একটু বড় করে ভাবার ইচ্ছে

হতেই পারে। বুঝলেন, এই জমানায় প্রোডিউসার পাওয়া যাবে না। এমনকী স্বয়ং সত্যজিৎ রায় হলেও তাকিয়ে থাকতে হত শ্রীকান্ত মোহতা বা স্বরূপ বিশ্বাসদের দিকে। আর মাথার ওপর অফুরন্ত ‘অনুপ্রেরণা’ না থাকলেও কিছু হওয়ার নয়।

নতুন গোয়েন্দা কাহিনি নিয়ে শুরু করবেন। তা ভাল। বেছে নিলেন শীর্ষেন্দুর শবরকে। ব্যাপারটা মন্দ হল না। কিন্তু এই মহাশয় এক গোয়েন্দায় সন্তুষ্ট নন। হাত বাড়াতে হল ব্যোমকেশের দিকে। দল ভাঙানোর খেলা। অঞ্জন শিবির থেকে আনা হল আবিরকে। একইসঙ্গে ব্যোমকেশ ছিনতাই, একইসঙ্গে ফেলুদাও ছিনতাই (কারণ,

তখন আবির মানে দুটোই)। উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে কে না সামিল হতে চায়! ছবিটা যে খুব মন্দ হল, এমন নয়। হ্যাঁ, ছবিটা তিনি বানাতে জানেন। ছবির মার্কেটিং থেকে পাবলিসিটি, সব মিলিয়ে কমপ্লিট প্যাকেজ। এমনকী শুটিং স্পটে ঝামেলা হলে কীভাবে পাল্টা চমকাতে হয়, পুলিশ লেলিয়ে দিতে হয়, সেটাও জানেন।

এই পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিকই আছে। কিন্তু বায়ু বড় সাংঘাতিক জিনিস। বাংলার বায়ু, বাংলার ফল। আরেক পুচ্ছপাকা কমলেশ্বর মুখুজ্জের ভূত শ্রীমান অরিন্দমের ওপরেও চেপেছে। কমলেশ্বর বিভূতিভূষণের চাঁদের পাহাড় করলেন। তারপরই মনে

হল, এবার বিভূতিবাবুকে হটিয়ে দিয়ে নিজেই গল্প লিখলে কেমন হয়! ব্যাস, বানিয়ে ফেললেন অ্যামাজন অভিযান। মোহতাবাবুর কল্যাণে শঙ্করের নতুন স্রষ্টা আমাদের কমলেশ্বর। একই ব্যামো বোধ হয় অরিন্দমকে তাড়া করছে। তাঁর মনে হচ্ছে, খামোখা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়কে আর জড়িয়ে লাভ কী? বুড়ো বয়সে মানুষটাকে আর কষ্ট দিয়ে লাভ কী? তিনি নিজেই যদি শবর লেখেন, কেমন হয়! এমন আবদারের কথা আবার শীর্ষেন্দুকে বলেও রেখেছেন। বেচারা শীর্ষেন্দু! তাঁর শবর আর তাঁর থাকবে না! বিভূতিবাবুর মৃত্যুর পর শঙ্করের মালিকানা হাতছাড়া হয়েছিল। কিন্তু শীর্ষেন্দুবাবুকে হয়ত

জীবদ্দশাতেই শুনে যেতে হবে, শবর আর তাঁর সৃষ্টি নয়।

এখানেই বায়ু থামেনি। শীতকাল এসে গেছে সুপর্ণা। এবার শখ হয়েছে ফেলুদা বানাবেন। সন্দীপ রায়ের কাছে সত্ত্ব চেয়ে বসে আছেন। আরও এক নিপাট ভাল মানুষ এই সন্দীপ রায়। বাবার সৃষ্টি সযত্নে আগলে রেখেছিলেন। এটাও না বেহাত হয়ে যায়! কারণ, শীর্ষেন্দু বা সন্দীপ বিলক্ষণ জানেন, 'অনুপ্রেরণা' নামক শব্দটি বড় ভয়ঙ্কর। ফেলুদাতেও কিন্তু শেষ নয়। এবার ইচ্ছে হয়েছে, প্রসেনজিৎকে নিয়ে সিনেমা করার। এবং তা এই বছরেই। প্রসেনজিৎ–ও 'হ্যাঁ' বলেই দিয়েছেন।

আপাতত প্রেম-ট্রেম জাতীয় কিছু একটা হবে। তারপর কি তবে কাকাবাবু ছিনতাই! এখনই এমন ইচ্ছে নেই। তবে শীতল বায়ু কমে গিয়ে বৈশাখের বায়ুতে এমন ইচ্ছে হবে না, কে বলতে পারে! ওই যে বললাম, বায়ু বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস।।

অনুপ্রেরণা! জিন্দালরা এবার আমগাছ লাগাবে!

সেই কতকাল আগে কেউ একজন বলেছিলেন, কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ, কৃষি থেকে শিল্পে উত্তরণ। সারা বিশ্ব এই নিয়মেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু জিন্দালবাবুদের যে কী হল! তারা হাঁটছে একেবারেই উল্টো পথে। সত্যিই, অনুপ্রেরণা বড় সাংঘাতিক জিনিস।

প্রায় বছর দশেক আগে এই রাজ্যে পা পড়েছিল সজ্জন জিন্দালের। দারুণ স্বপ্ন

দেখিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেদিন কথা ছিল, প্রায় ৩৫ হাজার কোটি বিনিয়োগ করে শালবনিতে তৈরি হবে ইস্পাত কারখানা। কাজ পাবেন অন্তত ৫ হাজার মানুষ।

তারপর যা হয়! সবকিছুই কেমন উল্টে পাল্টে গেল। ছিল বেড়াল, হয়ে গেল রুমাল। দিদিমণির মন রাখতে শেষমেষ সিমেন্ট কারখানার শিলান্যাস। মাত্র দেড়শো লোকের কর্মসংস্থান। তার কী ঘটা করে শিলান্যাস হয়েছিল ২ বছর আগে। শালবনিতে কী ঘটা করে উদ্বোধনটাই না হল। যেন রাজ্যে শিল্পের জোয়ার বয়ে গেল! করলি তো বাবা একটা সিমেন্ট কারখানা, চাকরি তো দিলি মাত্র দেড়শো লোককে।

এত ঘটার কী আছে বাপু!

পরের ঘোষণাটা আরও মারাত্মক। এবার তারা নাকি গাছ লাগাবেন। আম, কলা, লিচু, বেদানা এসব লাগাবেন। এতে অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হবে। হায় রে! জিন্দালবাবুদের কী দুর্দশা। ইস্পাত কারখানা ছেড়ে তাঁদের এবার আম গাছ লাগাতে হবে! আর সেটাও ফলাও করে বলতে হচ্ছে! শিল্প যাদের ভিত্তি ছিল, গাছ লাগানো কিনা তাদের ভবিষ্যৎ হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

সত্যিই, অনুপ্রেরণা বড় সাংঘাতিক জিনিস।

ভূমিকম্পে এমন আদিখ্যেতা! বাঙালিই দেখাতে পারে

সকাল থেকে এক অদ্ভুত আদিখ্যেতা শুরু হয়েছে। টিভি চ্যানেলগুলোকেও বলিহারি। কাজ নেই, অমনি ডান্ডা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ভূমিকম্পের লাইভ কভারেজ। কেউ পৌঁছে গেল পাতাল রেলে, তো কেউ সেক্টর ফাইভে। আদিখ্যেতার শেষ নেই।

আর লোকগুলোও তেমনি, সবাই ভীড় করে রাস্তায় নেমে গেল। যেন মেলা

চলছে। একেকজনের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, যেন স্বপ্না বর্মনের মতো এশিয়ান গেমসে সোনা পেল। অফিস থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেছে। আর দাঁত কেলিয়ে টিভিতে বাইট দিয়ে চলেছে। যেন বিরাট বীরত্ব দেখিয়ে ফেলেছে। আর যাদের বাইট নিতে কোনও চ্যানেল আসেনি, তারাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন! দিব্যি সেলফি তুলছে, আর সাঁটিয়ে দিচ্ছেন নিজের ফেবু-র দেওয়ালে। ফুটেজ খাওয়া হল এক মহামারী রোগ। ভূমিকম্প হলে, সেখান থেকেও যেটুকু ফুটেজ খাওয়া যায়!

দক্ষিণ কলকাতা চত্বরে একজন বলে উঠল, 'ভাগ্যিস দিনের বেলা ভূমিকম্প

হয়েছে। রাতের বেলায় হলে কী করতাম? তখন তো বুঝতেই পারতাম না।' আহা, রাতে হলে কী ক্ষতি হত? দিনে জেনেই বা কী এমন বীরত্ব দেখালি? সেই তো ঘর থেকে ছুটে রাস্তায় এলি। ঘর তো অক্ষতই রইল। যদি রাতে হত, ঘুমিয়ে থাকতিস, কখন ধরণী কেঁপে উঠল, বুঝতে পারতিস না। সেটাই তো ভাল ছিল।

এই আহাম্মকগুলো বুঝতেই চায় না, তেমন জোরালো ভূমিকম্প হলে রাস্তায় বেরোনোর সুযোগই পাওয়া যেত না। ঘরের ছিটকিনি খোলার অনেক আগেই হুড়মুড়িয়ে সব ভেঙে পড়ত। সিঁড়ি বা লিফট খোঁজার ফুরসত পাওয়া যেত না।

আর রাস্তায় নেমে এলেই কি নিস্তার ছিল? দুপাশের বাড়িগুলো হুড়মুড়িয়ে পড়ত।

হালকা ভূমিকম্প। বাড়িগুলো পড়েনি। তাই রাস্তায় বেরিয়ে বীরত্ব। যেন উসাইন বোল্টের মতো অলিম্পিকে সোনা জিতেছে। সত্যিই, ভূমিকম্প নিয়ে এমন আদিখ্যেতা বাঙালিই দেখাতে পারে।

মোহনবাগান যদি এমন শর্ত দিত!

দীপ্তেন্দ্র কুমার সান্যাল (নীলকণ্ঠ) একটা প্রশ্ন করেছিলেন। ‘বেশি টাকা থাকলে কী হয়?’ তারপর নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন— সিনেমার পোস্টারে সত্যজিৎ রায়ের উপরে আর ডি বনশলের নাম থাকে।

এখন যদি প্রশ্নটা করা হয়? তাহলে বলতে হবে, টাকা থাকলে মুকেশ আম্বানির বউও দেশের ফুটবলকে শাসন করেন। আর বাকি সবাই তাঁদের সামনে নতজানু হয়ে পড়েন। ‘ইয়েস ম্যাডাম’, ‘হেঁ হেঁ’ করে ফুটবল

কর্তারা দাঁত কেলিয়ে হাঁসতে থাকেন।

বউদিমণির কী আবদার! মোহনবাগানের জার্সি বদলাতে হবে। রঙ বদলাবে। লোগো বদলাবে। পালতোলা নৌকোটাও হয়ত বদলে দেবে। রিলায়েন্সবাবুরা (বা গিন্নি) এখানেই থেমে থাকবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। আরও কতকিছু বদল চাইবে। বলবে হেড অফিস ময়দান চত্বরে রাখা চলবে না। রিলায়েন্স হাউসের কোনও একটা ঘরে হয়ত কর্পোরেট অফিস হবে। সরকারি ঠিকানা মুম্বই হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মোহনবাগান কর্তারাও তেমনি। অঞ্জন মিত্র

এমনিতে এত দিস্তা দিস্তা চিঠি লেখেন। আর যখন চিঠি লেখার দরকার, তখন কলমকে শীতঘুমে পাঠিয়ে দেন। রিলায়েন্স চুক্তি চাইছে। রিলায়েন্স বন্ধুত্ব করতে চাইছে। বেশ ভাল কথা। কিন্তু বন্ধুত্ব তো একতরফা হয় না। সমানে সমানেই হয়। রিলায়েন্স যদি শর্ত চাপায়, মোহনবাগানও পাল্টা শর্ত দিতেই পারে। অঞ্জন মিত্রদের মাথায় বুদ্ধি-সুদ্ধি সব ভোঁতা হয়ে গেছে। তাই, আমি নন্দ ঘোষ, মোহনবাগানের হয়ে পাল্টা কিছু শর্ত পাঠিয়ে রাখলাম। রিলায়েন্স কর্তারা ভেবে দেখতে পারেন। মোহনবাগান কর্তারাও ভেবে দেখতে পারেন।

১) আপনাদের জন্ম ১৯৬৫ তে। আর

আমাদের জন্ম ১৮৮৯ এ। আপনাদের বয়স ৫১ বছর। আর আমাদের ক্লাবের বয়স ১২৮ বছর। তাহলে কে পুরনো? কে বড় দাদা হতে পারে?

২) আপনারা আন্তর্জাতিক হয়েছেন অনেক পরে। আর আমরা আন্তর্জাতিক হয়েছি সেই ১৯১১ তে। যখন খালি পায়ে গোরা সাহেবদের হারিয়েছিলাম। স্বাধীনতা সংগ্রামকে একধাপ এগিয়ে দিয়েছিলাম।

৩) আপনাদের মতো এমন শিল্পগোষ্ঠী দেশে অনেক আছে। কিন্তু জাতীয় ক্লাব দেশে একটাই আছে। জাতীয় ক্লাব, ব্যাপারটা বোঝেন?

৪) আপনারা কটা দেশে ছড়িয়ে আছেন? তার থেকে বেশি দেশে আমাদের সমর্থক ছড়িয়ে আছে। আমাদের সমর্থকদের কাছে আপনাদের কর্মীদের সংখ্যাটা নেহাতই নগন্য। তাছাড়া, যে আজ আপনার কর্মী, সে কাল অন্য কোম্পানির কর্মী হতে পারে। কিন্তু যে আমাদের সমর্থক, সে চিরকালই আমাদের সমর্থক।

৫) আমাদের জার্সির রঙ বদলাতে হবে। বেশ, ভাল কথা। আপনাদেরও লোগোটা বদলে নিন। ওটা হোক পাল তোলা নৌকো। গ্রাহকরা আশ্বস্ত হবে, এই নৌকো ডুববে না।

৬) রিলায়েন্সের প্রতিটি অফিসের ছাদে মোহনবাগানের পতাকা উড়ুক। মুকেশ আম্বানির বাড়ির ছাদেও উড়ুক। বেশ বড় করে ১৯১১-র 'অমর একাদশ' এর ছবি টাঙানো হোক।

৭) প্রতিটি জিও-র হোর্ডিং ও বিজ্ঞাপনে মোহনবাগানের নাম ও লোগো থাকুক। বিজ্ঞাপনের মডেল হোক মোহনবাগানের ফুটবলাররা।

৮) আইএসএল মানেই ফিল্মস্টারের ছড়াছড়ি। তাহলে আর নীতা আম্বানি কেন? আপনাদের বাড়িতেই আরেক বউ তো সিনেমা করতেন। নীতার বদলে টিনা

আম্বানিকে (মুনিম) আই এস এলের মুখ করা হোক।

৯) মোহনবাগানের সব ম্যাচে রিলায়েন্সের কর্তাদের মাঠে আসতে হবে। বিদেশ থেকে সেরা কোচ আনতে হবে। বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০) দুই শীর্ষ কর্তার যেমন মিল থাকবে। পরিবারেরও মিল থাকবে। টুটু বাবুর ছেলের পাশে মুকেশ আম্বানির ছেলেকে বসাতে হবে। আগে সে বেশ মোটাসোটা ছিল। না খাইয়ে তাকে পাতলা বানিয়ে দিয়েছেন। ওকে আবার খাওয়ান, খুব খাওয়ান। আবার আগের চেহারায় সে

ফিরে আসুক। তারপর আমাদের টুম্পাই দাদার পাশে বসুক। তবে তো মানাবে।

আপাতত দশ দফা পাঠিয়ে রাখলাম। আরও কিছু যোগ করা যায় কিনা, মোহন কর্তারা ভেবে দেখুন। নইলে অঞ্জন মিত্ররা একটা কাজ করতে পারেন। নন্দ ঘোষের কড়চার এই লেখাটাকেই কপি পেস্ট করে রিলায়েন্স বাবুদের কাছে পাঠিয়ে দিন।

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন